নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৪)

সেই আদিযুগ থেকে ভারত-নরনারী এই শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে আসছেন। সমস্ত সৃষ্টি-রহস্যই, এই দুই

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

শক্তি দ্বারা গঠিত এবং বিশ্বে পরিবেশিত। অনন্ত সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রাবলীও এই দুই আলোকে প্রদীপ্ত ও পরিব্যাপ্ত।

আদি শক্তি উদ্ভূত হল এই দুই শক্তির সংঘর্ষণে। অনন্ত আকাশের সাথে অনন্ত ব্যোমের ঘাত-প্রতিঘাতে, যে সব আলো ও মেঘের সৃষ্টি দ্বারা অনন্ত ভূমণ্ডলের বিচ্ছুরিত সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে, আরম্ভ-যোগের অনুশাসন শুরু হল, তাকেই বলে ওঁকার ধ্বনি উচ্চারণে—রা রা ধ্বনি এবং তারই স্থিত-শক্তির ধ্বনি—বা, মম্! মম্! মম্!—এই দুই ধ্বনির যোগবাণী যখন সৃষ্টিকর্ত্তা-রূপী আদিপ্রকৃতি বা অবয়ব-ধারীর অঙ্গ হতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তখনই তিনি এই প্রথম ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—ওম্! ওম্! অর্! অর্! বা মম্! মম্! রা! রা! চোর রত্নাকরও তাই এই দুই আদি ধ্বনি—''মম্! মম্! রা! রা''! অর্থাৎ ম'হরা মহ'রা, ম'রা ম'রা বলতে র-ম রা-ম, ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্বরূপ ''রামঃ! রামঃ রামঃ''— শব্দ, মন্ত্র-স্বরূপ নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন, আর তখনই তিনি নিলেন বল্মীকস্তূপের আকার-প্রকার বা সেই আদি-প্রকৃতির স্থিত-শক্তি-রূপের নাম বা ''রাম'' নাম।

এই আদি নাম বা ওঁকার ধ্বনি-রহস্যের প্রথম ধ্বনি বেরুতে মানুষের ষাট হাজার বৎসর জন্ম অতিবাহিত হয়। এই রহস্যেরই রূপকতথ্যে, পুরাণে লিখিত আছে যে, রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করেন।

রামকৃষ্ণদেবও এক বিরাট তান্ত্রিক পণ্ডিতের আগমন বার্ত্তা মনের কোণে পেয়ে, এই শক্তি-রহস্যেই পরিবৃত হয়ে উঠলেন। যেদিন যে মুহূর্তে ঐ দাম্ভিক শক্তি তাঁকে দম-দলিত করতে আসবে— তাও তিনি চিন্তামণির কৌস্তভ-মণি দ্বারা দূরদৃষ্টিতে দর্শন করলেন। সুতরাং যে মুহূর্তে সেই তন্ত্রধারী রাবণ-পণ্ডিত, তাঁর নয়ন-পলকে এসে পড়ল, অথচ সমবেত ভক্তবৃন্দের দৃষ্টির বাইরে পদার্পণ করল— রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠধ্বনি এক বিরাট রা—রা—রা ধ্বনিতে ভ'রে উঠল। তাঁরই সন্নিধানে উপবিষ্ট ভক্তগণও তাই চমকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠল।

রামকৃষ্ণদেবও এই দুরতিক্রম্য আদি ''ওম'' ধ্বনি বা ওঁ আকারধারীর রমণীয় রমণী মূর্ত্তি বা দেবীপ্রতিমা সন্দর্শনে স্বতঃই তাঁকে ''ওম্ মা''—''ও-মা'', ওগো জগৎতারিণী ''মা'' বলে প্রথম সম্বোধন করলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই শব্দ, এই ধ্বনি, এই রমণীয়া মাতৃমূর্ত্তি, প্রতি জড় এবং জীবের মাঝেও দর্শন করতে করতে, ভাব-বিমুগ্ধকণ্ঠে বিবেকানন্দকেও এক দিন বালক-সারল্যে, প্রদীপ্ত আনন্দ-বিহ্বলে বলে যেতে লাগলেন—তুই নিশ্চয়ই এই এক ঘটি গঙ্গাজলে আমার জগৎতারিণী মাকে দেখতে পাবি-ই পাবি—এই দ্যাখ্, ঘটির কানায় কানায় যে জল রয়েছে, ওরই মধ্যে বসে রয়েছে—মা জগদ্ধাত্রী। তার মানে কি জানিস্?

সমস্ত ঘটিটাকে একটা জগৎ বলে ধরবি তো? তাকে ধরে রেখেছে কে? বা ভ'রে রেখেছে কে? যে এই জগৎটাকে ধরে রেখেছে তাকেই বলে জগদ্ধাত্রী। বুঝলি তো? আচ্ছা—এবার তোর দৃষ্টি আরও তলার দিকে এগিয়ে নে চল, যতই দৃষ্টি তোর ঝাপসা হতে থাকবে, ততই বুঝবি তুই মা-মহামায়ার দিকে এগিয়ে চলেছিস্। সব জলেরই ঘাটগুলো যখন চিনতে পারবি তখনই বুঝবি তুই খেয়াঘাটে এসে পৌঁছেছিস। তখন আর কী দেখবি? শুধু তুই আর শুধু, মা গঙ্গার জল। তখন শব্দ কিসের পাবি? কেবল দাঁড় টানার শব্দ—সেই শব্দও দেখবি গেয়ে চলেছে—ওঁম্-মা, ওঁব্রহ্ম, ওঁমা, ওগো ব্রহ্মময়ী, জগৎতারিণী মা। এমনি যে জগতেই পরিভ্রমণ করবি, এমনকি রাস্তার ধূলো কাঁকরকেও তুই যখন পায়ে করে মাড়িয়ে চলবি, তখনই সে কেঁদে ওঠে, সেই মর্ম্মর ধ্বনি, সেই ম'রা ম'রা ধ্বনি বা সেই রাম নামের কণ্ঠধ্বনি দিয়ে বলে উঠবে—ওম্! মা! ওঁমা - ওঁমা।

সৃষ্টির এই রাম-বীণা বা রামের-বাণ যখন স্থিত, অবস্থিত এবং পূর্ণ-পরিবেশিত হয়ে কর্ম্ম করতে পারে, তখন তাকে বলে কৃষ্ণের বাঁশী বা স্থিত-প্রজ্ঞ মানে সমস্ত কর্ম্মেই আনন্দ পাওয়া এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করা। সূর্য্যের আলো দেওয়াকে,

রামের-তীর বলে। আলোকরাশির উপভোগ, সম্ভোগ বা কর্ম্মফল প্রাপ্তির নামই কৃষ্ণের বাঁশী। ভূমণ্ডল সৃষ্টির পর যে সমস্ত জীব-জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হল, তাকেই রামশক্তি বলা হয় ও সেই জীব-জগতের বিভিন্ন কর্ম্ম নিযুক্ত শক্তিকেই কৃষ্ণশক্তি বলা হয়। জড়জগৎ এবং জীবজগৎ যে একই জগৎ, এই দুই জগৎই একের সঙ্গে অন্য যে ওতপ্রোতঃ ভাবে জড়িত, এই শক্তি-রহস্যের জ্ঞান লাভ করা এবং তদনুসারে কর্ম্ম করার নামই—''রাম ও কৃষ্ণ'' বা ''রামকৃষ্ণ''।

এই দুই শক্তির মিলন-রহস্যকেই অভেদজ্ঞান বলে। রামকৃষ্ণদেবের অঙ্গে এই অভেদ শক্তির সেতুবাঁধা ছিল বলেই, তিনি যুগাবতার ''শ্রীরামকৃষ্ণ''। এইজন্যই তাঁর জাতিভেদ ছিল না। জড়জগৎ বা জীবজগৎ সেই একই নারায়ণী-শক্তি দ্বারা চালিত বলে, তাদের প্রণাম, পূজা এবং সেই বিধিবদ্ধে কৃষ্ণের বাঁশী বাজাতে পারতেন। জগৎমাতাও তাই তাঁর সম্বন্ধে বলতেন—''আমার রামকৃষ্ণের এক হাতে তীর, লক্ষ্য-স্থির অন্য হাতে মুরলী বাজায়''।

শ্রীশ্রীকালীমাতা বলতেন—''আমার নধর গোপালের এক হাতে মা, অন্য হাতে ছা''।

শ্রীশ্রীভবতারিণী বা তারা-মা বলতেন—

''রামের তীর, আর সীতা হাতে, ক্ষীরের বাটী রাধা তাতে।।

মা ছাড়া সে চলতে নারে, ''রামকৃষ্ণ'' মোর হাতে নাড়ে''

নির্ভীক যুবক বিবেকানন্দ ক্ষণেকের জন্য বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে নিজেকে আত্মস্থ করে জোড়হস্তে রামকৃষ্ণদেবের সন্নিকটস্থ হয়ে প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন—আমি ত জানিনা কেন এই অভূতপূর্ব্ব বিকট শব্দ আমার কণ্ঠ হতে বেরুল। আমি শুধু দেখলাম—বাইরের দরজায় একজন নূতন অতিথি পদার্পণ করল মাত্র—ঐ দ্যাখ সত্যি সত্যিই এইখানেই আসচে কিনা। সমবেত ভক্তমণ্ডলী উৎসুক দৃষ্টিতে সেই রাবণ-পণ্ডিতের দিকে চেয়ে রইল।

এই আদিশক্তি ধ্বনিতে, নীত শক্তির নামই ''রাম''। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবকেও আমরা সেই আদিশক্তির রূপধারী রামরঘুমণি বলে পূজা করতে পারি।

বিশ্বপ্রকৃতির লীলাতেও আমরা এই রহস্য দেখতে পাই। সপ্ত-সমুদ্রের বারিরাশি অনন্ত আকাশে, তীরের ফলার মতই উর্দ্ধগামী হতে থাকে এবং এই সময়ে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তার সেই ধ্বনির চমকানি শক্তির নামকেই বলা যায়, সেই আদি ''মর্ম্মর বাণী'' বা ম'রা ম'রা শব্দের প্রতিধ্বনি 'রাম' নাম মাত্র।

সূর্যোদয়ের পূর্ব্ব প্রহরেও সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বুকে যখন নিপতিত হতে আরম্ভ হয়, তখনও এই আদিধ্বনির ওঁকার নাদ শ্রুত হতে থাকে, নিদ্রা-মগ্ন মুনিঋষিগণও সেই ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে স্বতঃই গাত্রোত্থান করতে বাধ্য হয়ে পড়েন এবং সেই আদি ব্রহ্মবাণী ওঁকার ধ্বনি দিয়েই সেই সৃষ্টি-কর্ত্তার পূজা আরম্ভ করেন।

রামকৃষ্ণদেবও এই ওঁকার ধ্বনিতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে, অর্থাৎ রাত্রি তৃতীয় প্রহরে একদিন হঠাৎ জেগে উঠে দেখলেন—রাশি রাশি চক্রাকারে চন্দ্রমা-কিরণ তাঁরই শয়নমন্দিরে ঘূর্ণায়মান। এসব অলৌকিক ''ওঁ'' আকারের নীল-চন্দ্রমার আলোরাশি দর্শনে প্রথমে তিনি স্তব্ধ, বিমূঢ় এবং বিমুগ্ধ হয়ে এই আলোর খেলাকে মা-মহামায়ার মায়া-রহস্যের লীলা বুঝলেন। কিন্তু এই সব ওঁকার আলোর যোগ-খেলায় যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করলেন—একটা গোল চন্দ্রমাকৃতি আলো, অন্য আলো-গোলকের সাথে খেলা করতে করতে যেই মিশে যাচ্ছে, অমনি একটা ''অম্'' ধ্বনি যা ওঁ ধ্বনি, তাঁর কানে আসছে—আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেই সময় এই অনুভূতি পাচ্ছেন যেন তাঁর বুকে, পেটে ও শিরদেশে এক ধ্বনি জেগে উঠছে—ওঁ রা-ওঁরা, ওঁ-রামঃ। ওঁ-কৃ ওঁ-কৃ, ওঁ-কৃ, ওঁ কৃষ্ণ। বাইরেও আবার কে যেন তারই প্রতিধ্বনি দিয়ে মন্ত্রসুরে সেই রামের বাণে জর্জ্জরিত হয়ে বলে উঠছে—ওঁ রামকৃষ্ণ। ওঁ রামকৃষ্ণ। ওঁ রামকৃষ্ণ।

আলোর সাথে আলোর মিলন সংঘাতেই, এই ওঁকার ধ্বনির সৃষ্টি-রহস্য। পুরানতথ্যে এরই রূপকথা-কহিনী, গোপন আকারে পরিবেশিত হয়েছিল, আজও তাঁর রজঃধূলি বা সেই অজ রাজার নীলকান্ত নন্দনের বা রামরঘুমণির পূজা করে থাকি। এই সমস্ত আমূল তথ্য-রহস্য নীত এবং আদিশক্তি রহস্যাবৃত শক্তিই আকারধারীরূপে—এই যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তথ্যও এই রামের বাণে জর্জ্জরিত। যখনই যা মাটিতে পড়ে, তাতে একটা ওঁ ধ্বনিই উত্থিত হয়। সৃষ্টিভেদেও আমরা সব মানুষকে একই মানুষ মনে করে থাকি, কিন্তু শক্তি-রহস্যের তারতম্য আছে বলেই তাদের আকার বিভিন্ন। একই মানুষ, একই মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে

বিভিন্ন নরনারীর সৃষ্টি-রহস্যেও, সেই একই ''ওম্'' ''মা'' বা রমণীয় রমণী বা রামের সৃষ্টি দেখতে পাই।

ষোড়শীমাতা হাসতে হাসতে বলে যেতেন—''পঙ্গু চালায় রথের চাকা! রামের ধনুক করল বাঁকা! শিবকে নিয়ে নৃত্য করে! কৃষ্ণ পেল শিবের বরে! শিবের জটা; মাকে দিয়ে, 'রামকৃষ্ণ' ঘোরে দ্বারী হয়ে?''

রামকৃষ্ণদেব বলতেন—একদিন মা-জগদ্ধাত্রীও এসে মৃদু-স্নিগ্ধ প্রেম-মাধুর্য্যের অমৃত পরশ দিয়ে, বাম হাতে রাম-রঘুমণি ও দখিণ হাতে কৃষ্ণকে নিয়ে, আমার আঁখির আগে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—''মা মহামায়ার জগতে এরা এত দিন তোরই অঙ্গে, আমার সাথেই লুকিয়ে ছিল—আজ তুই এদের বাঁধনহারা করেছিস্, আমার বুকের কৌস্তভ-মণি এই রামরঘুমণি আর অমর জগতের অমৃত-খনি এই নীল-কান্তমণি রাধা-কান্তকে আজ থেকে তোরই কাছে রেখে চল্লুম।''

ঠিক এই তিথিতেই শ্রীমাও একদিন রামকৃষ্ণদেবকে নিরালায় পেয়ে বিষাদসুরে বলে উঠেছিলেন—''আমার সব কিছুই যেন হারিয়ে গেছে। মায়ের কথাও শুনি না, কৃষ্ণের বাঁশীও বাজে না। সবাই যেন তোমার কাছেই দেখি ঘুরে বেড়ায়। এমন কেন হল ব'ল ত?'' ঐ কথায় রামকৃষ্ণদেবের আঁখিতে জল ভ'রে উঠল ও কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে, আপন মনে বলতে লাগলেন—''তুমি না দিলে আমি কেমন করে পাব? তুমিই যে সেই 'ভবতারিণী'।''

...ক্রমশঃ

নারীর শ্রী যদি প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে সে কখনও নারীত্বের আদর্শ হতে পারে না।

—ঋষি অনির্বাণ

মূরলী

যে বাঁশী বেজেছিল
দ্বাপরে কুঞ্জবনে
সে বাঁশী আজও বাজে
বিশ্ব-প্রাণের মাঝে
মহাকাশের সকল কোণে
জগতে সব চেতনে।
যে শোনার সেই তা শোনে
যে বোঝার সেই যে বোঝে-
বোঝে আপন বোধের মাঝে।।

প্রাণ-অপান, ব্যান ও উদান -
সমানে মিলিলে সমান
সেই সুর পরাণ মাঝে
মধুময় সুরে বাজে
যে শোনার সেই তা শোনে
যে বোঝার সেই যে বোঝে-
বোঝে আপন মনের কোণে।।

অধীরে দেয়না ধরা
স্থির প্রাণে জাগায় সাড়া
সুরেরই আকুলতায়
হৃদয়ের ব্যাকুলতায়।
যে শোনার সেই তা শোনে
যে বোঝার সেই যে বোঝে-
মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে।।

দ্বাপরে লীলার শেষে
গোলকে ফিরেছে সে
তবু সেই বাঁশের বাঁশীর
সুর যে বেড়ায় ভাসি
খেলা করে আধার সনে
নির্মল প্রাণের কোণে।
যে শোনার সেই তা শোনে
যে বোঝার সেই যে বোঝে-
হৃদয়েরই কুঞ্জবনে।।

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া